যে মন্দিরে পতিতারা রানি

পিন্টু রহমান

পয়স্তি প্রকাশন

যে মন্দিরে পতিতারা রানি
পিন্টু রহমান

প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা–২০২৫ খ্রি.

প্রকাশক : পয়স্তি প্রকাশন
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা– ৭২১০।
ঢাকা অফিস : ২/৮৪, এভিনিউ–১, কালশি রোড,
সেকশন–১২, ব্লক– বি, ঢাকা–১২১৬।

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com

প্রচ্ছদ : শোভানবীন

মুদ্রণ : ফরায়েজী গ্রাফিক্স হাউজ

মূল্য : ৩২০ টাকা

স্বত্ব : লেখক

ISBN : 978-984-97704-0-4
Je Mondire Potitara Rani by *Pintu Rahman*
Publication of Payasti Prokashon
First Published Ekushey Granthamela-2025
Price Tk 320.00 $ 12.00

উৎসর্গ

জুলাই জেনোসাইড ও আগস্ট বিপ্লবে শহীদ

এবঙ

অঙশগ্রহনকারী ছাত্র–জনতা...

গ | ল্প | ক্র | ম

যে মন্দিরে পতিতারা রানি ৭
উদাসী হাওয়া ১৯
কবিতমাষু ২৫
বৃক্ষশাখায় জীবনানন্দ ৩৪
দীর্ঘশ্বাস ৪২
মাটিগন্ধি পরাণ ৪৭
কাজলের নীলা ৫৭
জলসাঘর ৬৪
নিরুদ্দেশযাত্রা ৭১
সমুদ্রবিলাস ৮২
এক অন্ধজনের প্রেমকথা ৯১

যে মন্দিরে পতিতারা রানি

নিরুত্তাপ চোখে অঙ্গের বসন খুলতে শুরু করে মেয়েটি। খোঁপার কাঁটা খোলে, গলার মালা খোলে, হাতের বালা খোলে, ওড়না খোলে, কামিজ খোলে কিন্তু অর্ন্তবাসে আটকে যায়। আশরাফ ফারাজি তাকে থামিয়ে দেয়। থেমে যায় মেয়েটি। অন্যসময় হলে ভাবতো, আগুনে জল পড়লো বোধহয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে কামনা। শরীর বিনিময় করা তাদের নেশা ও পেশা। ইচ্ছে কিঙবা অনিচ্ছায় অচেনা শরীর ও মনের সাথে সুখ–অসুখ বিনিময় করতে হয়। মাসি বলে– মারে, অতিথি নারায়ণ; তাদের ফেরাতে নেই। তাতে গেরস্থের অমঙ্গল হয়।

অমঙ্গল পরাস্ত করতে প্রথম প্রথম অসুবিধা হতো। ইদানিঙ অভ্যাস হয়ে গেছে। মানুষ বস্তুত অভ্যাসের দাস। অতিথি না এলেই বরঙ খারাপ লাগে। রাত্রে ঠিকঠাক ঘুম হয় না। বিছানায় শুয়ে এপাশ–ওপাশ করে। মাঝরাতে শরীর জেগে উঠলে ভয়ানক বিপদ। অহর্নিশ কামনার আগুনে জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হয়। পিপাসাকাতর শরীরে জলের সান্নিধ্য কামনা করে। ফলে মাঝে–মাঝে একজন স্থায়ী সঙ্গীর কথা ভাবে সে। সঙ্গী থাকতে আপত্তি কীসের! অনেকেরই তো রয়েছে। তবে সঙ্গী হিসেবে আশরাফ লোকটিকে তার পছন্দ নয়। দাদার বয়সী মানুষটাকে দিয়ে কী হবে! নাহ, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। উপরুন্ত জলের সান্নিধ্যে জলপিপাসায় মরতে হবে। একদা লালন সাঁইজিও এমনিভাবে মরেছিল। মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে ময়দানে হাজির হয় মাসি। তা না হলে প্রথম দফায় ফিরিয়ে দিয়েছিল। লোকটিও ঘরের পথ ধরেছিল। কিন্তু মাসি বলে ভিন্নকথা– ছি. ছি. মা, নারায়ণ ফেরাতে নেই। উনাকে ফিরিয়ে আনো। দেরি করো না মোটেও।

ফিরে আসে আশরাফ। কামনা তাকে ফিরিয়ে আনে। চোখে–মুখে রাগ কিঙবা ক্ষোভের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বেশ হাসিখুশি। প্রাণবন্ত। ম্লান হেসে নেশার পেয়ালায় চুমুক দেয় আর নারী শরীরের গোপন রহস্য নিরীক্ষণ করে। কেরু এন্ড কোম্পানির খাঁটি মদ। বিশেষ অতিথি না হলে মাসি দামি মদ পাঠায় না। সাধারণ হলে তো বিপদ– চড়–থাপ্পড় পর্যন্ত মারতে হয়। আশরাফ ফারাজি ভাগ্যবান বটে। মাসি তাকে দামি মদ পাঠিয়েছে। লোকটি কী তবে মাসির চেনাজানা, নাকি বিশেষ কেউ! এমন ভাবনা অবশ্য হালে পানি পায় না। চেহারাসূরতে স্পষ্টতই জীর্ণতার ছাপ। আর যা'ই হোক এমন জরাজীর্ণ খদ্দেরের সাথে মাসির সখ্যতা হতে পারে না। কুতকুতে লালাভ চোখে লোকটি ঢকাঢক মদ পান করে। আকণ্ঠ যেনো পিপাসাকাতর! কামনার পানে তাচ্ছিল্লময় চোখে এক–আধবার তাকায়। ব্যথিত হয় মেয়েটি। আনমনে ফুঁসে ওঠে– ইস, দেমাগ কত্ত! যেনো পাত্তাই দিতে চায় না!

মনে মনে এও ভাবে– কীসের এতো দেমাগ তার! অন্য কেউ হলে এতক্ষণে জড়িয়ে ধরতো। দু'বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতো! কিঙবা শরীরের ব্যাকরণ ভুলে হারিয়ে যেত অথৈ সমুদ্রে। হালভাঙা নাবিকের পালতোলা নৌকোয় চেপে পাড়ি জমাতো দ্বারুচিনি দ্বীপের সীমানায়। আয়নার সম্মুখে দাঁড়ায় সে। নিজের রুপ অবলোকন করে নিজেই মুগ্ধ হয়। মুগ্ধতার চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সাধারণ একটা ব্রা'তেও অসাধারণ মানিয়েছে! গহনাগুলো থাকলে ভালো হতো। বিশেষ মুহূর্তে নিজেকে তার সত্যি সত্যি রানি মনে হয়– রুপকথার রাজরানি। বুড়োর ভাগ্য যে, এমন একজন সঙ্গী পেয়েছে! অথচ ভাগ্যকে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় সে। বেচারা নেশার ঘোরে মত্ত। অস্পষ্ট স্বরে কী সব বলাবলি করে। কামনা বিরক্ত হয়। পেশার প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা কমে যায়। মাঝে মাঝে এমন কিছু নেশাখোর আসে, যারা উচ্চস্বরে চিৎকার চেঁচামেচি করে। গালমন্দ করে। অশ্লীল কথা বলে। কেউ কেউ আবার গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হয়। কামনার তখন কাঁদতে ইচ্ছে করে। নারায়ণ ভেবে নীরবে অপমান হজম করতে ভালো লাগে না তখন। কামনা একা না, প্রত্যেকের জন্য অভিন্ন বিধান। মাসি বলে, সব পেশাতেই কিছু না কিছু খারাপ দিক রয়েছে।

মেয়েটি খারাপ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করে। দমকে দমকে লোকটির কাশি ওঠে। সিঁদুরের মতো রাঙা দুটি চোখ। কামনা জলের কথা বলে– কী গো নাগর, জল নেবে! যদি চাও তো জল এনে দিই।

আশরাফ ফারাজি হাত নাড়ে। না, তার জলের প্রয়োজন নেই। সে এসেছে আগুন নিয়ে খেলতে। মাত্রই তো খেলা শুরু! নক্ষত্রের আলোয় পথ চিনে দুর্গম পথে পাড়ি জমাতে হবে। জানতে হবে, এ পথের শেষ কোথায়! পথের খোঁজে পথ হারিয়ে লোকটি বেসামাল। চোখের আগুনের তীব্রতা আর আগের মতো নেই। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসে। বিছানার উপর শরীর এলিয়ে দেয়। কামনার চোখে অপেক্ষার রঙ। অর্ন্তবাসে আর কতক্ষণ; একজন পুরুষের জন্য আর কত অপেক্ষা করবে। তবু ভালো, শরীর জেগে ওঠেনি। বুড়োকে তাহলে খুবলে খুবলে খেত। বুঝতো, এ পথে পা দেওয়ার জ্বালা কী!

দুই.

সে'ই প্রথম মন্দিরে আগমন। তারপর থেকে আশরাফ ফারাজি নিয়মিত। রাত নামলে ক্লান্ত পায়ে উপস্থিত হয়। আহা, বেচারা মন্দিরের প্রেমিক! নামেই মন্দির! আর সব ঠন ঠনাঠন ঠন। শরীরময় জীর্ণতার ছাপ। চাকচিক্যহীন। অপ্রসস্থ রাস্তা। ঘিঞ্জি বসতি। ক্রমেই যেনো বসবাসের যোগ্যতা হারাচ্ছে। খদ্দেরের আর্থিক সক্ষমতাও কমতির পথে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে যেসব মাড়োয়াড়িরা মন্দির নির্মাণ করেছিল, তাদের কেউ আর এদেশে নেই। একাত্তর পরবর্তী সময়ে ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ওপারে ফিরে গেছে। উপকার যা তা কেবল, স্থানীয় পতিতাদের। জীবিকার তাগিদে নিজেদের মতো করে সঙসার পেতেছে। শহর ঘুমিয়ে পড়লেও বাসিন্দারা জেগে থাকে। নতুন নতুন খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করে।

যশোর শহরের বিশেষ ওই মন্দিরের টানে আশরাফ ফারাজি নিয়ত ছুটে আসে। কামনাও বুঝে গেছে বৃদ্ধ লোকটি তার নাগর। নাগরকে নিয়ে আগে ক্ষোভ–আক্ষেপ থাকলেও মাসি পাত্তা দিত না। ফলে অসম বয়স ও মনের সম্ভোগ গুটি গুটি পায়ে সম্মুখ হাটে। বুড়োর জ্বালাতন তার গাঁ–সওয়া হয়ে গেছে। রাগের পরিবর্তে এখন কেবল অভিমান। একটু একটু করে মনের কোণে অভিমান পুঞ্জিভূত হয়েছে। লোকটি কোনদিন না এলেই বরঙ খারাপ